কলকাতার ভিক্ষুক

উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)

[Kolkatar Bhikkhuk: Utpotti, Bikash O Aartho-Samajik Porjalochona (1901-2011)]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা অনুষদের ইতিহাস বিভাগে
পি.এইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

গবেষক

প্রসেনজিৎ নস্কর

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রেজি. নং: A00HI1201517 of 2017-2018

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৩

কলকাতার ভিক্ষুক: উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)

Certified that the Thesis entitled

"কলকাতার ভিক্ষুক: উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক পর্যালোচনা (১৯০১-২০১১)" [Kolkatar Bhikkhuk: Utpotti, Bikash O Aartho-Samajik Porjalochona (1901-2011)] submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Rup Kumar Barman, Professor, Department of History, Jadavpur University,** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere /elsewhere.

Countersigned by the Supervisor

Rup Kumar Barman 04.8.2023

Dr. Rup Kumar Barman
Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700032
Dated:

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate

Prosenjit Naskar 04.08.23

Prosenjit Naskar
Dated:

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সময়ে সমাজ বিজ্ঞানের শাখা হিসাবে ইতিহাসের গবেষণায় নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ও তার পরিবর্ধন প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবেশ, নিম্নবর্গীয় প্রভৃতির ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি 'প্রান্তিক মানুষের ইতিহাসচর্চা'র দিগন্তও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। তত্ত্বগতভাবে 'প্রান্তিক মানব' শব্দটি নতুন হলেও আদতে এই মানুষেরা মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই ছিলেন। বর্তমানে 'প্রান্তিক মানবে'র তাত্ত্বিক রূপটি গড়ে উঠেছে মাত্র। 'প্রান্তিকতা তত্ত্বে'র (Marginality Discourse) প্রথাগত ধারণার বাইরেও সাম্প্রতিককালে ইতিহাসের গবেষণায় নতুন নতুন বিষয়ের সংযোজন ঘটছে। সেক্ষেত্রে এই প্রান্তিকতা তত্ত্বের মধ্যেই ভিক্ষুক শ্রেণি সম্পর্কিত ইতিহাসোচিত চর্চা উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে 'প্রান্তিকতা' বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং কীভাবে প্রান্তিকতা থেকে সামাজিক স্তরে ভিক্ষুকদের আর্বিভাব ঘটছে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা প্রয়োজন।

'Marginal' ইংরেজি শব্দটি সমাজ বিজ্ঞানে ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যবহার করা হয়। যার আক্ষরিক বাংলা অর্থ হল প্রান্তিক। 'প্রান্তিক' কথাটির অর্থ সাধারণভাবে বোঝানো হয় সমাজের মূল স্রোতের বাইরে থাকা গোষ্ঠীগুলিকে; যাদের অবস্থান সমাজের একেবারে নিম্নস্তরে। 'প্রান্তিক' শব্দটির বিবর্তনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে প্রান্তিকতা। বর্তমানে প্রান্তিকতার সংজ্ঞা সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বৌদ্ধিক প্রতর্ক রয়েছে। কোনো জাতি বা গোষ্ঠী অকস্মাৎ প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হয় না, সামাজিক বৈষম্যের অবস্থানে ধীরে ধীরে প্রান্তিকতায় পরিবর্তিত হতে থাকে। একাধারে 'প্রান্তিক' মানুষদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ভেসে ওঠে। প্রান্তিক গোষ্ঠীরা মূলত একই প্রজাতি, গোষ্ঠী, জাতপাতের সাথে যুক্ত নয়। এই 'প্রান্তিক' গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের অবস্থান রয়েছে, যাদের সঙ্গে সমাজের

যোগাযোগ প্রায় ক্ষীণ অবস্থায় রয়েছে; আবার এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল ধারার সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগই নেই। প্রান্তিকতার রূপ প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির ভাষা, খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, জনঘনত্ব, প্রতিবন্ধকতা ও ব্যক্তিভেদে। প্রসঙ্গত, উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিমী ভাবুকদের দ্বারা এই শব্দটির সৃষ্টি। তারা বিষয়টিকে জনসমক্ষে তুলতে গিয়ে বলেছেন;

'Marginality is generally used to describe and analyse socio-cultural, political and economic spheres, where disadvantaged people struggle to gain access (societal and spatial) to resources, and full participation in social life. In other words, marginalished people might be socially, economically, politically and legally ignored, exculded or neglected, and are therefore vulnerable to livelihood change.'

এক্ষেত্রে বলা যায়, প্রান্তিকতা হল সমাজ বৃত্তের সেই পরিধি যেখানে কোন একক মানব বা মানব গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে কেন্দ্রের তুলনায় দূরে অবস্থান করে এবং সেই অবস্থান থেকে উন্নততর অবস্থানে আসার জন্য সংগ্রাম করে। কেন-না তার কাছে এই অবস্থানটি বিপজ্জনক। এই সকল প্রান্তিক মানুষজন নানাভাবে নিগৃহীত, অসম্মানিত এবং অবজ্ঞার শিকার হয়ে থাকেন। আর এই প্রান্তিকতা তত্ত্বের মধ্যেই ভিক্ষুকদের অবস্থান আলোচিত হতে পারে।

ভারতীয় সমাজ জীবনে 'ভিক্ষা' এবং 'ভিক্ষু', এই শব্দ দুটি অতি প্রাচীন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, বৌদ্ধ ধর্ম যখন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রসারলাভ করেছিল, তখনই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শব্দের বহুলাংশে প্রসার ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক নারী ও পুরুষদের মূলত শ্রমণ ও শ্রমণা বলা হলেও প্রচলিত ভাষায় তাঁরা ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী নামেও পরিচিত ছিলেন। ভিক্ষা শব্দটি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে সম্মানজনক হলেও বর্তমানে এই শব্দ থেকেই উদ্ভূত 'ভিক্ষুক' শব্দটিতে দীনতার ভাব প্রকাশ পায়। এই ভিক্ষুক শব্দের পাশাপাশি আরো একটি শব্দ

উঠে আসে, তা হল ‘কাঙাল’ শব্দটি। অথচ শব্দগতভাবে ভিক্ষুক আর কাঙাল দুটি কাছাকাছি হলেও অর্থগতভাবে এক নয়। ভিক্ষুক শব্দের সঙ্গে দীন ভাব জড়িয়ে থাকলেও কাঙাল কথাটি সম্বোধনের দিক দিয়ে অনেকটা উচ্চস্তরের। মূলত সাধক, আউল, বাউল, শাহী, দরবেশ এবং ভারতের সনাতন ধর্ম ও তার থেকে উৎপন্ন অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের জন্য এই কাঙাল কথাটি ব্যবহার করতেন।

ভিক্ষা কী? কালের স্রোতে এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে, - “begger” means a person who indulges in begging; “begging” means — (i) soliciting alms in a public place, including railways, bus-stops, road sides and public transport, by invoking compassion; and (ii) entering in any private premises for the purpose of soliciting or receiving alms; ভিক্ষা মূলত পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজের এমন এক জটিল ও বহুমুখী সমস্যা, যা প্রায়শই একাধিক ও আন্তঃসম্পর্কিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর কাঠামোগত বঞ্চনার নিদর্শন হয়ে ওঠে। তাই এটি ‘সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা’কে চিহ্নিত করে। এ কারণে ভিক্ষাবৃত্তির বিষয়টি সমাজের শুধুমাত্র অবহেলিত সমস্যাই নয়, এটি ক্রমশই ভারতের অন্যতম একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে।

বর্তমান সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে; ফলত দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে ‘দারিদ্র্য’ (Poverty) এবং ‘দরিদ্র’ (Poor) এই ধারণাগুলির প্রাসঙ্গিকতা বাড়ছে। ভারতে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বিশ্বের দরিদ্র মানুষের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। সূচনাপর্বে দারিদ্র্যকে সংজ্ঞায়িত করা হত জীবিকার ভিত্তিতে এবং পশ্চিমি দেশগুলিতে মানুষের এই জীবিকা ছিল মূলত ব্যবস্যা ও শিল্পবিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিংশ শতকের শেষভাগ থেকে দারিদ্র্যকে পুনঃসংজ্ঞায়িত করা হয় মানুষের দুর্দশাগ্রস্ততার ভিত্তিতে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং

ইউনেস্কোর দারিদ্র্যের এই সংজ্ঞাকে গ্রহণ করতে থাকে। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য নিরসন করা একবিংশ শতাব্দীর একটি বড় মোকাবিলার বিষয়। ইউএন হ্যাবিট্যাট ২০০৫-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, বিশ্ব দারিদ্র্যসীমার মান হল মাথা পিছু আয় প্রতিদিন ১.২৫ ডলার, যার নীচে এক বিলিয়ন মানুষ বাস করে। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাংকের অনুমান অনুসারে, মোট ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় ২৬.১ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ২০১১-এর গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স (GHI) রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত ৪৫তম স্থানে অবস্থান করে।

দারিদ্র্যের এই সমস্যাটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক সমস্যাতেও এটি একটি বহুল চর্চার বিষয়; তাই দেখা যাচ্ছে বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজকর্মী দারিদ্র্যের সামাজিক সমস্যার দিকটির প্রতি আলোকপাত করে আসছেন।[৯] তাঁদের পর্যবেক্ষন এবং গবেষণায় যেমন কর্মহীনতা, বাস্তুচ্যুতি, অনাহার দারিদ্র্যের এক একটি বিয়য় হয়ে উঠেছে, ঠিক সেভাবেই ভিক্ষাবৃত্তি ও ভিক্ষুকও তাঁদের পর্যবেক্ষনের বাইরে থাকতে পারেনি।[১০] তাই ভিক্ষার বিষয়টি এখন আর আমাদের সমাজে অবজ্ঞার বিষয় নয়। এই ধারণাকে অনুসরণ করে বর্তমান গবেষণায় পশিমবঙ্গের বিশেষ করে কলকাতা জেলার ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় ভিক্ষাবৃত্তির কারণ, ভিক্ষুকদের সমস্যা এবং তাঁদের প্রতিকারের ব্যবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতে ১৯৭১-২০১১ সালের মধ্যবর্তী সময়পর্বে ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক চিত্রকে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, ভিক্ষুকদের সংখ্যা কখনও হ্রাস আবার কখনও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে, - ১৯৭১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ১০,১১,৬১৯ জন। যার মধ্যে ৫,৯১,৫০১, জন পুরুষ ও ৪,২০,১১৮ জন মহিলা। ১৯৮১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৭,৫০,৩০৭

জন, এর মধ্যে ৪,৫০,৪১৯ জন পুরুষ ও ২,৯৯,৮৮৮ জন মহিলা ভিক্ষুক। ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রতিবেদন অনুসারে, ভিক্ষুকের সংখ্যা ৫,৪২,৮৭৫ জনের মধ্যে ৩,৩২,৫৫৬ জন পুরুষ ও ২,১০,৩১৯ জন মহিলা ভিক্ষুক। ২০০১ সালে সংখ্যাটি ৬,৩০,৯৪০ জন। যার মধ্যে ৩,২১,৬৯৪ জন পুরুষ ও ৩,০৫,৯৯৪ জন মহিলা ভিক্ষুক। এবং ২০১১ সালে সংখ্যাটি ৪,১৩,৬৭০ তে নেমে আসে। এর মধ্যে ২.২ লক্ষ পুরুষ ও ১.৯১ লক্ষ নারী। তবে ভিক্ষুকের এই সংখ্যাটি কোন অংশে কম নয়। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের ২০১১ সালে ভিক্ষুকের সংখ্যা ৮১,২৪৪ জন এর মধ্যে ৩৩,০৮৬ (৪০.৭২ শতাংশ) জন পুরুষ ও ৪৮,১৫৮ (৫৯.২৮ শতাংশ) জন নারী।

বর্তমান সময়ে সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল খাদ্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের জোগান এবং চাহিদার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান ক্রমশই প্রকটিত হচ্ছে। ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কালক্রমে বাড়ছে। এমতাবস্থায় সমাজের দরিদ্র মানুষ তাদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ কোনরকম কাজ না পেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও কায়ক্লেশে বাঁচার জন্য ক্রমশ 'ভিক্ষাবৃত্তি'কে বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করছে। তবে ভিক্ষুক সমস্যা শুধুমাত্র বর্তমান সময়ের সমস্যা নয়। ভিক্ষাবৃত্তির উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে বিভিন্ন গবেষক একাধিক মত প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ করা যায়, আদিম সভ্যতায় ভিক্ষাবৃত্তির ধারণা ছিল না। কারণ আদিম সভ্যতায় সামাজিক কাঠামো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। যেগুলি বিভিন্ন সময়ে একে অন্যকে সাহায্য করত। মূলত সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপত্তি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তিরও উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন সভ্যতায় ভিক্ষাদানকে 'পুণ্যার্জন' ও ভিক্ষাবৃত্তিকে 'সম্মানজনক কার্য' বলে মনে করা হত। একই সঙ্গে সে সময় ভিক্ষাদান ছিল ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অর্থাৎ সে সময় ভিক্ষাবৃত্তিকে

কোন রকম সমস্যা হিসাবেই গন্য করা হত না। কিন্তু বর্তমান সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি 'পেশা'য় পরিণত হওয়ায় ভিক্ষুক সমস্যা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

জনবসতি ও শিল্পায়নের কারণে সমাজ ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলছে। জীবিকার তাগিদে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার মতো শহরগুলিতেও তৈরী হচ্ছে জটিল আর্থ-সামাজিক সমস্যা। যা প্রকারন্তরে ঐ রাজ্যের অর্থনীতিতে কুপ্রভাব ফেলছে। সমাজের কিছু কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে 'দয়া ও অক্ষম মানুষের প্রতি সমবেদনা' হিসাবে বিবেচনা করেন। অপরদিকে কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে আর্থ-সামাজিক সমস্যা বা সামাজিক ব্যাধি হিসাবে ব্যক্ত করেন। ভিক্ষাবৃত্তি প্রসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়, - (ক) ভিক্ষাবৃত্তি হল অসামাজিক ও অপরাধমূলক পেশা, যা সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে। (খ) ভিক্ষাবৃত্তি মানব সভ্যতার কুৎসিত রূপকে প্রভাবিত করে। (গ) ভিক্ষাবৃত্তি সকল প্রকার শারিরীক প্রতিবন্ধী ও অক্ষম মানুষের সামাজিক ন্যায় বিচারকে আঘাত করে।

ভারতীয় সমাজে দুই প্রকার ভিক্ষুক লক্ষ করা যায়, যথা – (ক) কিছু মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে বাধ্য হয় ভিক্ষুকে পরিণত হতে। (খ) আবার কিছু মানুষ আছে যারা স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তিকে বেছে নেয়। মূলত দারিদ্রতা ও শারীরিক অক্ষমতার (শারীরিক প্রতিবন্ধী, বয়ঃবৃদ্ধ, শিশু, মানসিক রোগগ্রস্থ ব্যাক্তি) কারণে মানুষ ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে। অপরাংশে যেসকল মানুষ স্বেচ্ছায় ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে এটা সম্পূর্ণ তাদের মানসিক প্রবৃত্তি। ফলে বর্তমান সময়ে ভিক্ষাবৃত্তি একটি লোভনীয় পেশায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত শহরাঞ্চলে সামান্য কিছু পয়সা ভিক্ষা প্রদান করা খুব একটা বড় সমস্যা হিসাবে গণ্য না করার ফলে ক্রমশ ভিক্ষুক শ্রেণির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা ক্রমশই ভারতের একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সকল সমস্যাগুলির বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে সমাজের

ভিক্ষুক সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে কলকাতার ভিক্ষুক শ্রেণির উৎপত্তি, বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়ে।

এক্ষেত্রে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায় হিসেবে ভূমিকাতে সন্দর্ভের মূল কাঠামোটি রূপায়ণ করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার সমস্যা, তাৎপর্য, গবেষণার ভৌগোলিক অবস্থান, বিষয়বস্তু, গবেষণার প্রশ্নাবলী, গবেষণার পদ্ধতি ও উপাদান, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ও অধ্যায় বিভাজন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গবেষণার তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির উদ্ভব ও বিবর্তন। এই অধ্যায়টিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক শ্রেণির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির আক্ষরিক অর্থের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তার পাশপাশি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির বাস্তবিক চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে ভারতের ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির চিত্রটিকেও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির ঐতিহাসিক বিবরণের বিষয়টি আলোচ্য সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়টিতে কলকাতার ভিক্ষুক ও ভিক্ষাবৃত্তির সামগ্রিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। ভিক্ষুক শ্রেণির সামগ্রিক ইতিহাসকে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিংশ শতকের প্রথম দশক থেকে একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের ধারাবাহিক ইতিহাসের পর্যায়কে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, ঔপনিবেশিক পর্ব (১৯০১-১৯৪৭), স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরণ পর্ব, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পর্ব (১৯৫১-১৯৮১), উদারীকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের পর্ব (১৯৮১-২০১১)। চতুর্থ অধ্যায়ে, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ভিক্ষাবৃত্তির উদ্ভবের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আর্থ-সামাজিক সমস্যার মূল দিকগুলিকে তুলে ধরার পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির কারণগুলিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া ভিক্ষা দেওয়ার কারণগুলিও আলোচ্য

অধ্যায়ে পর্যালোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়টিতে, রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেণির বিভাগ করা হয়েছে। ফলত ভারতীয় সামাজে ভিক্ষাবৃত্তি ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে যুক্ত থাকলেও সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাবৃত্তির শ্রেণি বিভাজন ঘটেছে। পাশাপাশি সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও নানান পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি ভিক্ষাবৃত্তির কৌশলগুলিকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। ভিক্ষুক শ্রেণির পুনর্বাসন, বিকল্প কর্মসংস্থান ও রাষ্ট্রীয় নীতির বিষয়গুলিকে তুলে ধরা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। পাশাপাশি ভিক্ষুকদের পুনবাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থার মধ্য দিয়ে ভিক্ষুক সমস্যার সমাধানের পদ্ধতির বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ের সমগ্র সন্দর্ভের উপসংহারে মধ্যে দিয়ে গবেষণা সন্দর্ভটির স্বরূপ দেখানো হয়েছে।

সূচক শব্দ: প্রান্তিকতা, কলকাতা, ভিক্ষুক, ভিক্ষাবৃত্তি, দরিদ্র, দারিদ্র্যতা, ইউরোপীয় ভবঘুরে আইন, বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন।

Rupkumar Barman
.... 04.08.2023

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Professor
Department of History
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Prosenjit Naskar
.... 04.08.2023

গবেষকের স্বাক্ষর